সোসাইটি পুস্তিকা-১৮

সাধনার অন্তরায়

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের
অধ্যক্ষ
বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, জোবরা
ও
বহু বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা

পালি বুক সোসাইটি
বাংলাদেশ
১২, হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম।

সোসাইটি পুস্তিকা—১৮

SADHANAR ANTHARAI

by

SREE JYOTIPAL MAHATHERO

Abbot, WORLD PEACE PAGODA
JOBRA, HATHAZARI, CHITTAGONG

সাধনার অন্তরায়

প্রকাশকাল ঃ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৯০ (২৫২৭ বুদ্ধাব্দ)

প্রকাশক ঃ পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ
১২, হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, জোবরা, হাটহাজারী এবং পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ কার্যালয়।

মুদ্রণে ঃ চেম্বার প্রেস লিমিটেড,
৫০, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ দুই টাকা

গুমানমর্দ্দন গ্রামের প্রয়াত শ্যামাচরণ বড়ুয়ার সন্তান সন্ততির অর্থানুকুল্যে পুস্তিকাটির মূল্যহ্রাস করা সম্ভবপর হলো।

প্রকাশনা বিভাগ,
পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

উৎসর্গ পত্র

ভিক্ষুজন্মের পরক্ষণেই যিনি জোবরা থেকে আমাকে গুমানমর্দ্দনের অথৈ সমুদ্রে ভাসমান বিহারে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যাঁকে আমার কোসা-নৌকায় মাঝিরূপে সর্বক্ষণ পেয়েছিলাম আমি তখন জানতাম না যে, তিনি ভব-সমুদ্র পারাপারের একজন সুযোগ্য মাঝি—পরম শ্রদ্ধেয় বিদর্শনাচার্য —শ্রীরাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী। তাঁরই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি নিবেদন করলাম।

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

আর্য্যশ্রাবক ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী

সর্বজন শ্রদ্ধেয় আর্য্যশ্রাবক ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দরী জন্ম হাটহাজারী থানার গুমানমর্দ্দন গ্রামে। সেই শুভদিনটি ছিল ৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৯৫ সন (২৪৩২ বুদ্ধাব্দ—১৮৮৮ ইং) পিতা হরচন্দ্র মুৎসুদ্দী ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ সমাজহিতৈষী ব্যক্তি। তাঁর পুত্রদ্বয় রাজেন্দ্র লাল ও যোগেন্দ্রলাল পিতৃগুণে গুণান্বিত। প্রথমজন হলেন সাধক এবং তাঁর অনুজ খ্যাতিমান সমাজসেবক ও চিন্তানায়ক। আর্য্যশ্রাবক রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী সম্বন্ধে সংঘনায়ক শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবিরের লেখা হতে যদিও কিছুটা জানা যায় তাঁর জীবনী অদ্যাবধি লিখিত হয়নি। আমরা আশা করি কোন ব্যক্তি এ দুরূহ কাজ করলে সমাজ উপকৃত হবেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির প্রয়াত প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া (ধর্মবিহারী ভিক্ষু) রচিত "বিদর্শন ভাবনা' গ্রন্থের অভিমত প্রকাশ করে উল্লেখ করেন "বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলার সাধকের মধ্যে বিদর্শন সাধকের প্রচলন হয়। আর্য্যশ্রাবক ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী এ বিষয়ে অগ্রণী। ব্রহ্মদেশের ডাইউ নগরীতে বিদর্শনারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি অনেক মুমুক্ষ সাধককে সাধনা—প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। তথায় ভিক্ষু উপাসক ও উপাসিকাদের এক সাধক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। "বিদর্শন—ভাবনা'র গ্রন্থকার সেই সম্প্রদায়ের অন্যতম কৃতবিদ্য সাধক। পরম পূজ্যাস্পদ সাধকপ্রবর জ্ঞানেশ্বর মহাস্থবিরও আর্য্যশ্রাবক রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দীর নিকট সাধনা প্রণালী শিক্ষা নেন।

আর্য্যশ্রাবক রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী সাধনা পদ্ধতিসহ বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক বিষয় বর্মী ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে বুঝাতে পারতেন। তাই বার্মার বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ ও নগরস্থিত ফুঙ্গি-চং (বিহার) হতে আমন্ত্রিত হতেন ধর্ম দেশনার জন্য। বর্মীরা তাঁকে সেয়াড রূপে শ্রদ্ধা করত। এখানে একটি সন্ধ্যায় (১৯৩৭ সালে) তাঁর ধর্ম দেশনার কথা উল্লেখ করছি যা আমার স্মৃতিতে চির ভাস্বর হয়ে আছে—আর্য্যশ্রাবক তাঁর প্রিয় বর্মী শিষ্যসহ ইনসিন (রেঙ্গুনের নিকটবর্তী শহর) বিহারে ধর্ম-দেশনার উদ্দেশ্যে যান। আমি আমার পিতার সাথে তাঁর অনুগমন করি। বিহারে আর্য্যশ্রাবকের উপস্থিতির সাথে সাথে প্রায় শ পাঁচেক উপাসক-উপসিকা এবং বিহারাধ্যক্ষসহ প্রায় একশত বৌদ্ধ ভিক্ষু দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। আমি এই অদ্ভূত দৃশ্য দেখে পিতাকে প্রশ্ন করি ভিক্ষুমন্ডলী কেন দাঁড়িয়েছেন; তিনি বললেন তিনি (আর্য্যশ্রাবক) যে সেয়াড (গুরু)। আর্য্যশ্রাবক দেশনা করার সময় ব্ল্যাক বোর্ড ব্যবহার করতেন। বোর্ডে তিনি দুরূহ বিষয় সহজ করার জন্য বিভিন্ন ডাইগ্রাম ও চিত্র আঁকতেন। আরেকটি পন্থার আশ্রয় তিনি নিতেন—সেটি হচ্ছে তাঁর শিষ্য, জটিল বিষয় যা' শ্রোতাদের সহজে বোধগম্য হওয়ার কথা নয়, প্রশ্ন করে গুরু (আর্য্যশ্রাবক) হতে উত্তর আদায় করে নিতেন। বহুদিন পরে বুঝতে পারি তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি বর্তমান প্রশ্ন-উত্তরে visual aid মাধ্যমে শিক্ষার মতন। কেবল যে বার্মার ভিক্ষু, উপাসক-উপাসিকারা তাঁকে শ্রদ্ধা করত তা নয় এদেশের ভিক্ষুরাও তাঁকে সে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা গেছে।

তিনি যখন অন্তিম শয্যায় তখন তাঁর প্রিয় শিষ্য সাধকপ্রবর জ্ঞানেশ্বর মহাস্থবির তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁর আশীর্ব প্রার্থনা পূর্বক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলে আর্য্যশ্রাবক মৃদুস্বরে বলেন "আপনি ত্রিচীবরধারী ভিক্ষু, আপনিই আশীর্বাদ করুন।" গুরু-শিষ্যের সেদিনের ভাব বিনিময়ের ঘটনা গুনমানমন্দিরবাসীর মনে এখনও চির জাগ্রত। মহান সাধক আর্য্যশ্রাবক ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী রবিবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ সন (২৪৯৬ বুদ্ধাব্দ-১৯৫২) পরলোক গমন করেন।

দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর পরে এই পুস্তিকা প্রকাশনার মাধ্যমে প্রয়াত আর্য্যশ্রাবক ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনে অংশ গ্রহণ করতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

১০ই অগ্রহায়ণ, ২৫২৭ বুদ্ধাব্দ. বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া
(১৩৯০—১৯৮৩) সাধারণ সম্পাদক,
পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

সাধনার অন্তরায়

সগ্‌গ মোক্‌খানং অন্তরাযং করোন্তীতি অন্তরাযিকা। তে কম্ম-কিলেস-বিপাক-উপবাদ-আণাতিক্কন্ত বসেন পঞ্চ-বিধা। তত্থ পঞ্চানন্তরিয ধম্মা কম্মান্তরাযিকা নাম। তথা ভিক্‌খুনী-দূসক কম্মং, তং মোক্‌খস্‌সেব অন্তরাযং করোতি ন সগ্‌গস্‌স। নিযত মিচ্ছা দিট্‌ঠি ধম্মা কিলেসান্তরাযিকা নাম। পণ্ডক তিরচ্ছান উভতো ব্যঞ্জ-কানং পটিসন্ধি ধম্ম বিপাকান্তরাযিকা নাম। অরিযো-পবাদা উপবাদান্তরাযিকা নাম। তে পন যাব অরিযে ন খমাপেন্তি তাবদেব ন ততোপরং সঞ্চিচ্চ আপন্নাপত্তিযো আণাতিক্কন্তান্তরাযিকা নাম।

সাধারণতঃ অন্তরায় বলতে বাধা-বিপত্তি, বিঘ্ন, আচ্ছাদন, আবরণ, নিবারণ, ঢাকনি, প্রতিবন্ধক ও প্রতিপক্ষ বুঝায়। স্বর্গ—মোক্ষের পথ আচ্ছাদন করে রাখে, উন্নতি লাভের ব্যাঘাত ঘটায়, জীবন-বিশুদ্ধি লাভে বাধা জন্মায়। বিবাদ-বিরোধ বিধ্বংসনে বিপত্তির সৃষ্টি করে—এসব অর্থে অন্তরায়। মানুষের জীবনে এমন সব অন্তরায়-কর ধর্ম অতীত ও বর্তমান জীবনের অকুশল কর্ম-বিপাক ও অকুশল কর্মরূপে বিদ্যমান থাকে, যা উচ্চাভিলাষ সিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক। সেই

অকুশল কর্ম জনিত প্রতিবন্ধকই আবরণ বা অন্তরায়। এই অন্তরায়-কর ধর্ম পাঁচ প্রকার। যথা ঃ **কর্মান্তরায়, ক্লেশান্তরায়, বিপাকান্তরায়, উপবাদান্তরায় ও আজ্ঞা-অমাণ্যান্তরায়।**

কর্মান্তরায়

কর্মান্তরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ মাতৃ-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, অর্হৎ-হত্যা, দ্বেষ-চিত্তে বুদ্ধ-দেহ হতে রক্তপাত এবং লোভ-দ্বেষ-সম্মানের বশবর্তী হয়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি—এই পাঁচ প্রকার মহা দুষ্কর্মকে কর্মান্তরায় বলে। এই পাঁচ প্রকার কর্মের মধ্যে কারো জীবনে যদি এক বা একাধিক দুষ্কর্ম সম্পাদিত হয়, তবে হাজার হাজার সৎকর্মে ডুবে থাকলেও নরক গমণ তার রোধ হবে না। নরক যন্ত্রণা ভোগ তার অবশ্যম্ভাবী। মোক্ষ-নির্বাণ সাক্ষাৎ করা তো দূরের কথা, সাধারণ স্বর্গ কিংবা সুগতি ভূমিতে জন্ম গ্রহণও তার পক্ষে সম্ভবপর নহে। এসব কর্ম মহা অপরাধ-মূলক। এ জাতীয় গুরুকর্মের ক্ষমা বা প্রায়শ্চিত্ত হয় না। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—এসব দুষ্কর্মা ব্যক্তি অবীচি মহানরকে জন্ম নেয় এবং অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। মৃত্যুর পূর্বে সময়-সুযোগ পাওয়া গেলে দুষ্কর্মের দুঃখদ বিপাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে অতিশয় অনুতপ্ত হৃদয়ে যদি ইহার প্রতিকারের নানাবিধ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করে; তবে নরকের আয়ুষ্কাল কমাতে পারে অর্থাৎ মহানরকে না জন্মে সাধারণ নরকে জন্ম নেয়। যেমন দ্বেষ-চিত্তে বুদ্ধদেহ হতে রক্তপাত করার ফলে অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়ে দেবদত্তের

নারকীয় আয়ুষ্কাল পরিবর্তিত হয়ে মহানরক-যন্ত্রণার লাঘব ঘটে। অনুরূপ, রাজা অজাতশত্রু তাঁর পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করার অপরাধ মোচন করার জন্য পিতার দেহ সৎকার, বারংবার কৃত দুষ্কর্মের অনুশোচনা, ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ, বুদ্ধ দর্শন ও বুদ্ধমুখে ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি সৎকর্মের প্রভাবে নরকের পরিবর্তন ঘটে। তিনি মহা দুঃখ-পূর্ণ অবীচি মহানরকে অনন্তকালের জন্য পতিত না হয়ে লৌহকুম্ভীপাক নরকে জন্ম নেন। অধিকন্তু দুষ্কর্ম করার পর অনুতাপ, ত্রিরত্নের শরণাগতি, বুদ্ধদর্শন, ধর্ম শ্রবণ প্রভৃতি বিবিধ কুশল কর্মের ফলে সুদূর ভবিষ্যতে তাঁর একটা পরম সৌভাগ্যের উৎস গড়ে উঠে। তিনি অনাগত অনন্তকাল গর্ভে একদিন পৃথিবীতে "প্রত্যেক বুদ্ধ" রূপে অবতীর্ণ হবেন।

এতদ্ব্যতীয় যদি কেহ কোন সাধারণ ভিক্ষুণী বা স্রোতাপন্ন ভিক্ষুণীর সাথে বলাৎকার করে, তা হলে তার ভিক্ষুণী-দূষক কর্মান্তরায় হয়। ইহার বিপাক স্বর্গ মোক্ষ উভয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তবে ভিক্ষুণীর সম্মতিক্রমে হলে তা মোক্ষ লাভের অন্তরায় হলেও স্বর্গলাভের অন্তরায় হয় না। অর্হৎ থেরী উৎপলবর্ণার প্রতি ব্যভিচার করে নন্দমানবক অবীচি মহানরকে পতিত হন। ভিক্ষুণদূষক কর্মও অন্তরায়-কর কর্মের অন্যতম।

ক্লেশান্তরায়

সাধারণতঃ ক্লেশান্তরায় ত্রিবিধ। যথা : অহেতুক-দৃষ্টি, অক্রিয়া-দৃষ্টি ও নাস্তিক-দৃষ্টি। মানুষ মনে করে— এ জগতে

স্থাবর-জঙ্গম যত সম্পদ, যত জীবিত সত্ত্বা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টির মূলে কোন হেতু নাই, প্রত্যয় নাই। কোন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তিতে সর্বপ্রকার পদার্থের সৃষ্টি ও বিলয় হয়ে থাকে। জাগতিক সবকিছু হেতু প্রত্যয় বিহীন—এরূপ ধারণাকে অহেতুক-দৃষ্টি বলে। এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে—এ জগতে দান শীল-ভাবনা বলে কোনরূপ কুশল কর্ম কিংবা প্রাণী-হিংসা, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যা, নেশা-পান বলে কোনরূপ অকুশল কর্ম নাই। কুশলাকুশল কর্মের ফল কিছু নাই। যা করা হয় তা' করার সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। সংক্ষেপে কর্ম ও ফলে অবিশ্বাস-সূচক ধারণাকে অক্রিয়া-দৃষ্টি বলে। আবার এরূপ এক শ্রেণীর লোক মনে করে—অতীত জন্মের কোন কর্মের ফল বর্তমান জন্মে সংক্রমিত হয় না অথবা ইহ জন্মে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করা হলেও ইহ জীবনে বা ভবিষ্যৎ জীবনে উহাদের কোনরূপ বিপাক প্রতিফলিত হবে না। অর্থাৎ অতীত-অনাগত জন্মের প্রতি অবিশ্বাস-মূলক ধারণাকে নাস্তিক দৃষ্টি বলে।

অহেতুক, অক্রিয়া ও নাস্তিক—এই ত্রিবিধ-দৃষ্টি মানুষের জীবনে অন্তরায়কর ধর্মরূপে পরিগণিত। উহাদের মূল উপাদান হচ্ছে দশবিদ ক্লেশ। যেমন ঃ লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, সন্দেহ, আলস্য, অবসাদ, ঔদ্ধত্য ও কৌকৃত্য। শুধু পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দৃষ্টি এই ক্লেশ সমূহ হতে উৎপন্ন হয় বলে উল্লেখ হয়েছে। বস্তুতঃ সর্বপ্রকার অকুশল কর্ম, অকুশল কর্ম জনিত যত অন্তরায়, যত অঘটন সব কিছুর মূলে রয়েছে এই ক্লেশ সমূহ। কোনরূপ ক্লেশ বা মানসিক বিকার ব্যতীত কোন

অন্তরায় কর্ম কিংবা অকুশল কর্ম সম্পাদিত হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্লেশের অর্থ, লক্ষণ, স্বভাব ও কৃত্য সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। ১। লোভ- লিপ্সা, আসক্তি, কামনা-বাসনা, তৃষ্ণা, পিপাসা, রাগ, অবিদ্যা ইত্যাদি অর্থে লোভ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা চরিত্র বৃত্তি বা মনোবিকার। এই মনোবিকারের শিকার হয়ে মানুষ মন-কর্ম, বাক্‌কর্ম ও কায়কর্ম সম্পাদন করে। প্রাণীগণকে দুঃখ সাগরে পরিচালনা করা ইহার কাজ। উপভোগে লোভের নিবৃত্তি হয় না, ইহা অতৃপ্ত বাসনা। এজন্য সূত্রপিটকে এই লোভ মনোবৃত্তিকে সহস্র বাহু বলে বর্ণনা করেছেন। এই লোভই মানুষকে পর সম্পত্তিতে, পর রাজ্যে প্রলুব্ধ করে এবং জাগতিক বিষয়বস্তুতে রঞ্জিত করে রাখে। কি মানুষ, কি ইতর প্রাণী সকলের মধ্যে এই লোভের তাড়না সমতুল্য। কুশল শক্তির প্রভাবে মানুষ ইহাকে সীমিত সংযমিত করে রাখে। ইতর প্রাণী তা পারে না ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ আপাতঃ দৃষ্টিতে হিংসাত্মক হলেও মূলতঃ লোভ চরি-তার্থতার অভাবেই এসব ঘটে থাকে। আকাঙ্ক্ষায় বাধা পড়লেই হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। আসক্তির অত্যুগ্র তাড়নায় মানুষ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, বিষ পান করে, আত্মহত্যা করে। লোভই অষ্টম এডওয়ার্ডকে আমেরিকান মহিলার প্রতি আসক্ত করে বৃটিশ সিংহাসন চ্যুত করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। এই আসক্তি যখন মানুষকে পুরাপুরী পেয়ে বসে তখন সে আর জগতে কিছুই দেখতে পায় না। জগতে

একাকার অন্ধকারই দেখে। ধর্মোপলব্ধি তার পক্ষে সম্ভব নহে।

২। **দ্বেষ** হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, প্রচণ্ডতা, প্রতিঘ, ব্যাপাদ ইত্যাদি অর্থে দ্বেষ মনোবৃত্তি। অপরকে হনন করে বলে প্রতিঘ। অপরের হিতসুখের বিপদ কামনা করে ব্যাপাদ। ক্রোধ বা প্রচণ্ডতা ইহার লক্ষণ। ইহা বিষধর সর্প হতেও ভীষণতর। অশনি নিপাততুল্য দ্রুত বিসর্পণ স্বভাব। অন্তর্দাহে দাবাগ্নি সদৃশ। আত্মহিত সাধনে শত্রুসম। সর্বস্ব অহিত সাধনে পূতিমূত্রবৎ। মাতৃ-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, অর্হৎ-হত্যা, দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধদেহ হতে রক্তপাত, সঙ্ঘভেদ প্রভৃতি কর্ম দ্বেষ চিত্তেরই কারণে। কেহ আমার অনিষ্ট করলে আমার প্রিয় বন্ধু কিংবা প্রিয়জনের অনিষ্ট সাধন করলে অথবা অপ্রিয়ের উপকার করলে দ্বেষের সৃষ্টি হয়। লোভের কাজ হল বিষয়কে রক্ষা করা, ভোগ করা, পরিত্যাগ না করা আর দ্বেষের কাজ হল বিষয়কে দূর করা, নস্যাৎ করা, ধ্বংস করা। এই মনোবৃত্তিই দেবদত্তকে বুদ্ধ হত্যায় নিযুক্ত করেছিল এবং অঙ্গুলিমালকে নরঘাতক দস্যু করেছিল।

মোহ—প্রাণীগণকে মোহিত করে বলে মোহ বা অজ্ঞানতা, অবিদ্যা, মিথ্যাজ্ঞান, কুপ্রজ্ঞা অন্ধকারের সঙ্গে তুলনীয়। অন্ধকার যেমন বস্তু নিচয়কে ঢেকে রাখে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিকে ব্যর্থ করে দেয় তেমনি মোহ বিষয় বস্তুর যথার্থ স্বভাবকে ঢেকে রাখে, চিত্তের কল্যাণ ও সম্যকদৃষ্টিকে ব্যর্থ করে দেয় ও চিত্তের অন্ধতা সৃষ্টি করে। জীবন ও জগতের স্বাভাবিক ধর্ম যে অনিত্য-দুঃখ অনাত্ম, তা আচ্ছাদন করে রাখা মোহের কাজ। মোহ সর্বপ্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের মূল।

সর্ব দুর্নীতির কারণ। লোভ-দ্বেষাদি মূলক সকল অকুশল মনোবৃত্তির মূল কারণও এই মোহ। কুশল কর্ম সম্পাদনে এই মোহ শক্তিহীন অন্ধ বটে; কিন্তু পাপ কর্ম সম্পাদনের জন্য নানা উপায় নির্দ্ধারণে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। আনবিক বোমা নির্মাণ, নিপুণ তাৎপর্য্য-পূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার, চুরি ডাকাতির বিচিত্র কৌশল, ব্যভিচারের দুরভিসন্ধি—সব মোহের প্রভাবে সংঘটিত।

মান—আমিত্ববোধ, অভিমান, অহংকার, আস্ফালন, দম্ভ, গোড়ামি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। অন্যের সাথে তুলনা করা মানের লক্ষণ। অন্যের সৌন্দর্য্য, কৌলীণ্য, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা, ধর্মজ্ঞান, চরিত্র, ধন-দৌলত, জায়গা-জমিন ইত্যাদি নানাবিষয়ে নিজকে তুলনা করে শ্রেষ্ঠ, সমকক্ষ ও হীন মনে করে বলেই মান অভিমান। শ্রেষ্ঠ মনে করার মধ্যে যেমন অহংকারবোধ থাকে তেমনি থাকে সমকক্ষ ও হীন মনে করার মধ্যে। এজন্য তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান ত্রিবিধাকারেই মানুষের অহংকার প্রকাশিত হয়। তৃষ্ণা, দৃষ্টি, মান এই মনোবৃত্তিত্রয় লোভ-মূলক চিত্তেই উৎপন্ন হয়। মান মনোবৃত্তিই অন্তরমূলে থেকে জগতে যত বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ-বিগ্রহ সৃষ্টি করে।

দাসানুদাস মূর্খ, পাগল সর্বত্র পরাজিত হয়েও উদ্ধত হয়ে থাকে। এরূপ হতভাগ্যগণও যদি মানীর মধ্যে গণ্য হয় তবে দীন হীন কাকে বলব? বস্তুতঃ মান মনোবৃত্তির আবার একটা কুশল দিক আছে। মান শত্রুকে জয় করার জন্য কাপুরুষতা ধ্বংস করে। মহদাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ করার জন্য অন্তরের দৃঢ়তা জ্ঞাপক যে অনুরাগ বা মান—তা ঊর্দ্ধগামী

সংযোজন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। মান-শত্রুকে নিহত করার আদর্শে যে মনোভাব বহন করে—সেই প্রকৃত মানী। এরূপ মান অন্তরে সর্বদা পোষণ করা কর্ত্তব্য।

সন্দেহ—চিত্তের সংশয়, দ্বি-মতি। এরূপ না সেরূপ, হ্যাঁ বা না এর সন্দেহ দোলায় চিত্ত যখন ঘড়ির দোলকের ন্যায় দুলতে থাকে তখনই সন্দেহের অবস্থা সৃষ্টি হয়। কোন বিষয় স্থির সিদ্ধান্তের অভাব কিংবা অক্ষমতা হেতু চিত্তের অস্থিরতাই সন্দেহের লক্ষণ। ইহাতে পরিণামে অস্থিরতাই সূচিত হয়। নানাবিষয়ে অনবরত চিত্তকে ঘুরান সন্দেহের কাজ। সন্দেহচিত্ত আপনজনকে পর করে, পরকে শত্রু করে। সর্বদা ভয়-ভীতি আনয়ন করে। চিত্তের একাগ্রতা আসতে দেয় না। সন্দেহের দোসর হল—অবিশ্বাস। অবিশ্বাস সর্বদা মোহ মৌলিক মনোবৃত্তি! শত্রুতা সৃষ্টির পক্ষে সন্দেহ বড় ভীষণ মনোভাব।

স্ত্যানমিদ্ধ—এই মনোবৃত্তি দুটি আলস্য। অবসাদ, সংকোচশীলতা, অনুৎসাহ, অস্পষ্টতা, তন্দ্রা, বিজৃম্ভা (হাই তোলা), লীনভাব, অকর্মণ্যতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। চিত্তের উৎসাহ, উদ্যম পরাক্রম নষ্ট করা ইহাদের কাজ। স্ত্যানমিদ্ধ কুশল কর্মের পরিকল্পনা গ্রহণে রোগ-দুর্বল ব্যক্তির ন্যায় শুধু শক্তিহীন নহে, অনিচ্ছুক। এই উভয় মনোবৃত্তিকে লক্ষণ, কাজ ও প্রতিপক্ষ—একই প্রকার বলে "পঞ্চনীবরণে" এক নবীনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। মনে হয় স্ত্যানমিদ্ধ মানুষের জীবনে এত দোষনীয় নহে। বস্তুতঃ তা নহে। স্ত্যানমিদ্ধ অত্যধিক মারাত্মক ব্যাধি, যে ব্যাধির আর উপশম নাই।

অপরাধ করলে অপরাধের ক্ষমা আছে, পাপ করলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু আলস্য অবসাদের ক্ষমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অলস ব্যক্তিকে আলস্যের দুর্ভোগ ভোগ করতেই হবে। আলস্য মানুষের জীবনে অখণ্ডনীয় অপরাধ, মহাপাপ।

ঔদ্ধত্য—উগ্রতা, অশান্ত, অশিষ্টতা, রূক্ষতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে বিষয় বস্তুকে অবলম্বন করে ঔদ্ধত্য উৎপন্ন হয় তার উপর বিত্তের উৎক্ষেপন, অশান্তি, অস্থিরতা ইত্যাদি—হয় তাতেই ঔদ্ধত্যের প্রকাশ ঘটে। ভস্মরাশিতে দণ্ডাঘাত করলে যেমন ভস্মরাশি আকাশে উড়তে থাকে, তেমনি উগ্র মেজাজী যখন তার বিষয় বস্তুর উপর ক্ষেপে যায় তখন বিত্তের পুনঃ পুনঃ লাফালাফির সাথে নিজেও লাফালাফি আরম্ভ করে। চোখেমুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। তখন উগ্র মেজাজী লোকটি কী যে করে ফেলে, সে নিজেও জানে না।

কৌকৃত্য—শব্দের অর্থ খেদ, অনুশোচনা, অনুতাপ, বিপ্রতিসার এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগই কৌকৃত্য। এই কৌকৃত্য দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়, (এক) "অকুশল কর্ম করা হল এবং (দুই) কুশল কর্ম করা হল না"। কৌকৃত্য সম্পন্ন লোক অকুশল কর্ম জনিত বদাভ্যাস ত্যাগ করে কুশল কর্ম জনিত সন্নতি ধারণ করতে পারে না। কৌকৃত্য মানসিক প্রফুল্লতা ও প্রশান্তি নষ্ট করে। অতি ক্ষুদ্র কর্মের অনুতাপ বৃহত্তর আকার ধারণ করে, শীলবান ধার্মিক ব্যক্তি নরক গমন করেছেন বলে শাস্ত্রে বর্ণনা আছে।

দৃষ্টি—বলতে মিথ্যা-দৃষ্টি, বিপরীত দর্শন, মিথ্যা মতলব, বিপরীত ধারণা, ভুল-বুঝা—বুঝায়। মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি মনে করে—তার অভিমতই সত্য, অন্য সব মিথ্যা। বিষয় বস্তুর যথার্থ স্বভাব পরিত্যাগ করে অযথার্থ বা মিথ্যা স্বরূপটি গ্রহণ করে। মিথ্যা দৃষ্টির প্রভাবে মানুষ অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ, অনাত্মকে আত্মা মনে করে। দিক্-ভ্রান্ত পুরুষ যেমন উত্তরকে দক্ষিণ, পূর্বকে পশ্চিম মনে করে, মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিও তেমন মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা, ব্যক্তিগত অশাশ্বত দেহ মনের প্রতি শাশ্বত-আত্মা বিশ্বাস স্থাপন করে। লোভনীয় বস্তুকে শুভ, সুখ, নিত্য ও আত্মা বলে গ্রহণ করা মিথ্যা-দৃষ্টির লক্ষণ। মিথ্যা-দৃষ্টির কারণ হল—অসদ্ধর্ম শ্রবণ, অকল্যাণ মিত্রতা, আর্য-দিগের অদর্শনেচ্ছা, অহেতুক চিন্তা। তীর্থ স্নানে পাপ ধ্বংস, দেবতা পূজায় ধন, বিদ্যা ও পুত্র লাভ, পুত্র-মুখ দর্শন দ্বারা পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার মানসে ভার্যা গ্রহণ, অজ্ঞাত শক্তিকে সন্তুষ্ট করে জীবন-মুক্তি লাভ, অপদেবতার প্রতি আশংকিত চিত্তে ব্রত-মানসাদি পালন, শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ ইত্যাদি মিথ্যা অন্ধ বিশ্বাস-জনিত কুসংস্কার পরম্পরার শিকার হয়ে বদ্ধ জীবন যাপন দৃষ্টিরই বিভিন্ন প্রকার-ভেদ। দৃষ্টি কুসংস্কারের জননী। পরম্পরাগত অন্ধ-বিশ্বাস ভাবাবেশ, মিথ্যা বাহ্যাচার, বাহ্যাড়ম্বর ও নিষ্কর্মা বুদ্ধি বিলাসে আবদ্ধ হয়ে মানুষ নিজের বুকের মধ্যে দৃষ্টিরূপ বিষধর সাপ-বিছাকে সযত্নে পুষে

রাখে। এই বিষধর সাপকে বিষধর সাপরূপে উপলব্ধি করতে পারলে বিলম্বে হলেও একদিন তার থেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে, নচেৎ সত্যের ঘোর অবমূল্যায়ন, ধর্মের নামে ঘোর অধর্মে বিচরণ করে আজীবন দংশিত হতেই থাকবে।

লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, ক্রোধ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ইত্যাদিকে সাধারণ বাংলা ভাষায় বলে মনোবিকার। এই মনোবিকারের শিকার হয়ে আমরা হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, ছলনা, বঞ্চনা, আত্মশ্লাঘা, পরনিন্দা, রুক্ষোক্তি, ভেদ-বাক্য, দল-কুলের রেষারেষি, নিকায়গত আস্ফালন সাম্প্রদায়িক হিংসা, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, ঝগড়া—বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অকুশল কর্ম সম্পাদন করে জীবনের প্রগতির পথ রুদ্ধ করি। সর্বক্ষণ অকুশল সংস্কার স্তুপাকার করে সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত হই, স্বর্গ-মোক্ষের অন্তরায় সৃষ্টি করে জীবন দুঃখ-ভারাক্রান্ত করি। এতে প্রত্যক্ষভাবে নিজের ও পরোক্ষভাবে অপরের দুঃখ-অশান্তির কারণ হই। মনোবিকার ব্যতীত মানসিক বাচনিক কিংবা শারীরিক কোন দুষ্কর্ম সম্পাদিত হতে পারে না। দূষিত মনো-তরঙ্গ আশে পাশের বাতাবরণকে প্রভাবিত ও দূষিত করে। পক্ষান্তরে বিকার বিমুক্ত চিত্ত বিকার-শূন্য হলেই সর্বশূন্য হয়ে যায় না। আমরা যখন দূষিত মনোবিকার-মুক্ত ও নির্মল থাকি তখন চিত্ত-গর্ভ বিপরীত আরেকটা ভাবে পূর্ণতা লাভ করে। তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের অন্তর স্নেহ-মমত্ব, মৈত্রী করুণা ইত্যাদি সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। জীবনে নেমে আসে স্বর্গীয় সুষমা। নির্মল বিশুদ্ধ চিত্তের তরঙ্গ-

গুলো আশে-পাশের বাতায়নকে প্রভাবিত করে বিশুদ্ধ করে তোলে। বিকার-বিহীন বিশুদ্ধ চিত্তের প্রকৃত সুখ শান্তির যদি লাঘব ঘটে, তবে বুঝতে হবে সে নিজের-মন কোনরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনাতে মশগুল তাই প্রকৃত সুখশান্তি থেকে বঞ্চিত।

মনোবিকার ধ্বংস ও প্রজ্ঞাদি গুণ-ধর্ম লাভের মূলে রয়েছে—আত্ম-দর্শন, আত্ম-সংযম সাধনা। ইহাই বৌদ্ধাদর্শের মূল মন্ত্র। কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বুদ্ধ-প্রশস্থি কবিতায় মোহ-মলিন মনোবৃত্তি বা মনোবিকারকে আঁধার, মলিন, কালো বিরূপ ও আবরণরূপে এবং প্রজ্ঞা-প্রদীপ মনোভাবকে জ্যোতিঃ, ভালো, আলো-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন—

"হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইণু শরণ,
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা
কর হে আমার লজ্জা হরণ।
পরশ রতন তোমারি চরণ,
যা কিছু মলিন যা কিছু কালো,
যা কিছু বিরূপ হোক তা ভালো।
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।
লইনু শরণ লইনু শরণ।"

কবিগুরুর এই কাকুতি পূর্ণ সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে বাংলা ভাষার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দে তথাগত বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের মূলাদর্শ সম্পূর্ণ রূপে রূপায়িত হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে—কর্মান্তরায় বর্ণনায় মাতৃ-হত্যা, পিতৃ-হত্যা ইত্যাদি অন্তরায়—কর কর্ম-সম্পাদন করলে হন্তার স্বর্গ-মোক্ষের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। অধিকন্তু সর্বাধিক দুঃখ-যন্ত্রণা-দায়ক অবীচি মহানরক ভোগ করতে হয়। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ ধর্মপদ গ্রন্থে মনোরম উপদেশচ্ছলে বলেন :—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিযে,

রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো হোতি ব্রাহ্মনো।

'মাতাপিতাকে হত্যা করে, ক্ষত্রিয় রাজা দুজনকে নিহত ক'রে এবং তাদের অনুচরবৃন্দ সহ রাজ্য ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হতে পারেন। শাস্ত্রে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় দেখা যায়—মাতা হচ্ছে—তৃষ্ণা, পিতা হচ্ছে-অহংকার দুজন ক্ষত্রিয় রাজা হল—শাশ্বত ও উচ্ছেদ মূলক যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টি। সানুচর রাষ্ট্র বলতে তৃষ্ণা ও অহংকারের সাথে সহজাত সকল প্রকার অকুশল মনোবৃত্তি সমূহকে বুঝায়। বিদর্শন সাধনার প্রভাবে যদি কোন ব্যক্তি তৃষ্ণা, দৃষ্টি মানাদি সর্ব-বিধ প্রপঞ্চ বা মনোবিকার ধ্বংস করতে পারেন, তবে তিনি ক্লেশ মুক্ত বা নিষ্পাপ হতে পারেন।

কর্মান্তরায়, বিপাকান্তরায় ইত্যাদি সকল প্রকার অন্তরায়ের মূলীভূত কারণ হল—ক্লেশান্তরায়। যদ্বারা মানুষের চিত্ত কলুষিত, পরিতপ্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মলিন ও নীচ হীন হয়ে যায়—তাই ক্লেশ বা মানসিক ক্লেদ। ইহারা চিত্তের নিত্য সহচর চৈতসিক বা মনোবৃত্তি রূপে বর্ণিত। এই ক্লেশগুলোই

চিত্তরাজ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে কাজ করে বলে ইহাদের বিভিন্ন প্রকার নাম। যে সকল মনোবৃত্তির কারণে অনুৎপন্ন কুশল চিত্ত-উৎপন্ন হতে পারে না, উৎপন্ন কুশল চিত্তকে রক্ষা করতে বা বৃদ্ধি করতে পারে না, অনুৎপন্ন অকুশল চিত্ত উৎপন্ন করে এবং উৎপন্ন অকুশল চিত্তের বোঝা ভারী করে; সেই মনোবৃত্তি দান-শীল ভাবনার বিঘ্ন, স্বর্গ-মোক্ষের নিবারণ-সেজন্য মনোবৃত্তিগুলোই শাস্ত্রে নীবরণ নামে বর্ণিত। যেমন বৃক্ষের পত্র-পল্লব, ফুল ফলের উপাদান বৃক্ষের অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে শায়িত থাকে। তেমন অকুশল মনোবৃত্তি বা ক্লেশগুলো চিত্ত-প্রবাহে প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে শায়িত থাকে—এজন্য ক্লেশের অপর নাম অনুশয়। আবার এই চৈতসিকগুলোই প্রাণীগণকে জন্ম হতে জন্মান্তরে বন্ধন করে, সংযোজন করে। তাই ইহাদের নাম সংযোজন।

ভিক্ষুদের উপলক্ষ্য করে তথাগত বুদ্ধের উপদেশ : সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং সিত্তা-তে লহুমেস্সতি. ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বান মেহেসি। "হে ভিক্ষু! এই দেহরূপ তরী পরিপূর্ণ জলে ভারাক্রান্ত। তাই ইহা সচ্ছল গতিতে চলে না। এভাবে যদি অসচ্ছল হয়ে পড়ে থাকে তবে অচিরেই সংসার সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব শীঘ্রই তোমার দেহ-তরী সিঞ্চন কর। সিঞ্চিত হলে তরীখানি হালকা হয়ে থাকে এবং অবাধ ত্বরিত গতিতে চলতে থাকবে। রাগ, দ্বেষ, মোহই এই দেহ রূপ তরীর অসীম ক্লেদাত্মক জলরাশি। ইহা নিশ্চিত জানবে যে এসব

রাগাদি বিকার মুক্ত হলেই এই তরীযোগে একদিন তুমি পরমাশান্তি নির্বাণ প্রদেশে বিচরণ করতে থাকবে।

বিপাকান্তরায়

তৃতীয় প্রকার অন্তরায় হচ্ছে বিপকান্তরায়। পূর্ব পূর্ব জন্মের অকুশল কর্ম ও অতিশয় ক্ষীণ পুণ্য কর্মের প্রভাব এই জন্মের প্রতিসন্ধি বা জন্ম পরিগ্রহ সংঘটিত হওয়ার কালে বিপকান্তরায় ফলপ্রসু হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে জন্মটাই অন্তরায়কর কর্ম বিপাকে পরিগনিত। জন্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার :– অহেতুক জন্ম (অকুশল অহেতুক ও কুশল অহেতুক), দ্বিহেতুক জন্ম (অলোভ ও অদ্বেষ), ত্রিহেতুক জন্ম (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ)। পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি তির্যগ্ প্রাণীগণ অকুশল অহেতুক জন্মের অন্তর্গত। জন্ম-বধির, খঞ্জ, কানা বোবা প্রভৃতি বিকলাঙ্গ মনুষ্যগণ ও ভূম্যাশ্রিত নিম্নশ্রেণীর অসুরাদি কুশল অহেতুক জন্মাধীন। পরিপূর্ণ অবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করলেও শক্তিশালী সংস্কারের অভাবে দ্বি-হেতুক সত্ত্বরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ফলে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞান দুর্বল হয়। তাতে তারা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের অধিকারী হতে পারে না। অহেতুক জন্ম গ্রহণকারী প্রণীগণের মোক্ষ নির্বাণ লাভের তো প্রশ্নই উঠে না। এক-হেতুক জন্ম নামের কোনরূপ প্রাণীর কথা শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। দ্বি-হেতুক পুরুষ ইহ জীবনে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করতে না পারলেও অবিরাম ভাবনার

অনুশীলন দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য পুণ্য-সংস্কার বর্দ্ধন করতে পারে। যোগাভ্যাসের ফলে পুঞ্জীভূত বলিষ্ঠ সংস্কার একদিন জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে মোক্ষলাভের অব্যর্থ হেতুরূপে সৌভাগ্যময় ফল প্রসব করবে। ত্রিবিধ বলবান হেতু সম্প্রযুক্ত (অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ) জন্মপরিগ্রাহক বিচক্ষণ ব্যক্তিই চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ও নির্বাণ লাভে সক্ষম। প্রথমোক্ত তিনপ্রকার সত্ত্বগণের মার্গফল বা মোক্ষ নির্বাণ লাভের যে অন্তরায় তা জন্মগত, পূর্ব জন্মার্জিত। অপুণ্য, পাপ সংস্কার অতিশয় ক্ষীণ পুণ্য সংস্কার জনিত। তাও মোক্ষ নির্বাণের অন্তরায়। বিদর্শন ভাবনা না করা পর্য্যন্ত সাধারণ জ্ঞানে কোন ব্যক্তির বিপাকান্তরায় আছে কিনা অথবা সে দ্বিহেতুক কিনা অনুমান করে বোঝা অতি কঠিন। সুখ শান্তি প্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রেরই বিদর্শন ভাবনা দ্বারা স্বীয় কর্মফল পরীক্ষা করে দেখা কর্ত্তব্য। যেহেতু বিদর্শন ভাবনা দ্বারা ইহজন্মে মহা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করতে না পারলেও পরমার্থ নামরূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান ও প্রত্যয় পরিগ্রহ জ্ঞান লাভ করে জগৎ ও জীবনের স্বাভাবিক লক্ষণ—অনিত্য—দুঃখ—অনাত্ম বোধ উপলব্ধি করে—'ছোট স্রোতাপত্তি' লাভ করতে পারেন।

উপবাদান্তরায়

ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা প্রভৃতি যে কোন আর্য পুরুষের প্রতি গালি, নিন্দা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ ইত্যাদি অবমাননা সূচক বাক্যাদি প্রয়োগ সহকারে অবজ্ঞা প্রদর্শন

করাকে উপবাদান্তরায় বলে। উহা স্বর্গ মোক্ষ লাভের অন্তরায়। যে সকল ব্যক্তি উক্তরূপ পাপানুষ্ঠান করে তাদের পক্ষে মার্গফল লাভ করা দূরে থাকুক, তারা কাম সুগতি ভূমিতেও জন্ম পরিগ্রহ করতে পারে না। অধিকন্তু মৃত্যুর পর অপায় ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করে অশেষ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে থাকে। এই অন্তরায় আর্য উপবাদান্তরায় নামেও বর্ণিত। আর্য দ্বিবিধ – যথা :— দর্শনার্য ও আচারার্য। যে ব্যক্তি মার্গ জ্ঞানে চার আর্য-সত্য প্রত্যক্ষ করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন, তিনি দর্শনার্য নামে প্রসিদ্ধ। আর যে ব্যক্তি চার আর্য সত্য প্রত্যক্ষ করার জন্য বিদর্শন ভাবনায় অবিরাম ভাবে নিমগ্ন তিনি আচারার্য নামে অভিহিত। সেরূপ আর্য পুরুষের প্রতি অবমাননা-সূচক গ্লানিকর অপবাদ করলে আর্যোপবাদ অন্তরায় হয়। এই অন্তরায় যদি জ্ঞাত-সারে কিংবা অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে, তবে তা প্রতিকার করা কর্তব্য। অন্তরায় হয়েছে বলে ধারণা জন্মিলেই তৎক্ষণাৎ আর্য পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে অন্তরায় মুক্ত হওয়া যায়। আর যদি সেই আর্য পুরুষ জীবিত না থাকে, তবে অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রদ্ধার সাথে মৃত আর্যপুরুষের উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও অন্তরায় মুক্ত হওয়া যায়।

এখন আমার অন্তরে স্বতঃই এরূপ প্রশ্ন জাগে যে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, শ্বশুর শ্বাশুরী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি গুরুজন বর্গের প্রতি অশ্রাব্য কটুক্তি সহকারে তুচ্ছ-

তাচ্ছিল্য করলে, গালি-গালাজ করলে, শারীরিক অত্যাচার করলে, তাঁদের সাথে অহঃরহ ঝগড়া-বিবাদ করলে তা কি আমাদের চিত্তপ্রবাহে সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অকুশল কর্ম-সংস্কার রূপে লুপ্ত থাকে না? সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি-সংস্কার কি জাগতিক উন্নতি কিংবা স্বর্গ-মোক্ষ লাভের ব্যাঘাত করবে না? এক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে কিরূপ কুফল ভোগ করতে হয় সে সম্পর্কে অট্‌ঠ-কথা আচার্যের দুটি গল্প বড় প্রণিধান যোগ্য।

বুদ্ধ শাসনের অপ্রতিহত ধারক স্তম্ভ অশীতি আর্য শ্রাবকগণের মধ্যে কচ্চায়ন মহাস্থবির অন্যতম। একদিন তিনি রাজগৃহের গিজ্ঝকূট পর্বত থেকে অবতরণ করতে ছিলেন। তখন রাজা অজাতশত্রুর প্রধান মন্ত্রী বর্ষকার ব্রাহ্মণ পর্বত থেকে মহাস্থবিরের অবতরণ দৃশ্য দেখতে পেয়ে সঙ্গীদিগকে বললেন—'দেখ, ঐ দেখ, পর্বত থেকে এক বানর অবতরণ করছে। মহাজ্ঞানী অর্থাৎ মহাস্থবিরের প্রতি এরূপ নিন্দা-সূচক বাক্যের বিষয় সমগ্র রাজগৃহে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। তখন তথাগত বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে বাস করতে ছিলেন। পরস্পর বলাবলিতে তথাগত ইহা শুনতে পেয়ে মন্তব্য করলেন বর্ষকার ব্রাহ্মণ আর্য নিন্দার ফলে মৃত্যুর পর এই রাজগৃহে বানর হয়ে জন্ম ধারণ করবেন। যদি মহাস্থবির কচ্চায়নের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে এই অপরাধ হতে মুক্তিলাভ করেবেন। নচেৎ নহে। তথাগত বুদ্ধের এই মন্তব্য শুনতে পেয়ে বর্ষকার ব্রাহ্মণ চিন্তিত

হয়ে পড়লেন যে তথাগত বুদ্ধ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সত্যবাদী। তার কথা অব্যর্থ। ক্ষমা প্রার্থনা, আমা হেন প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমি বানর কুলে জন্মধারণ করব! তথাপি ক্ষমা প্রার্থনা সম্ভবপর নহে। এই কথা নিশ্চিত উপলব্ধি করে চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং বুদ্ধি আঁটতে লাগলেন। সিদ্ধান্ত করলেন বানর তো হবো তবে খাবো কি? এই মতলবে তিনি রাজগৃহে নানাপ্রকার ফলবৃক্ষ রোপন করতে শুরু করলেন। কিছুদিন পর বর্ষকার ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে বানর কুলে জন্ম ধারণ করলেন।

জন্মের কয়েকমাস পর একদিন আহারের পর এক ঝাঁক বানর বিহার প্রাঙ্গনে এসেছিল বানরের ঝাঁক দেখে ভিক্ষুরা বলাবলি করতে লাগলেন যে তথাগত তো বলেছেন বর্ষ-ব্রাহ্মণ বানর হবেন। সত্যই কি বর্ষকার ব্রাহ্মণ বানর রূপে জন্মধারণ করলেন? ভিক্ষুদের এই বলাবলি শুনতে পেয়ে ভিক্ষুদের সন্দেহ নিরসন কল্পে তথাগত বুদ্ধ হে বর্ষকার' বলে আহবান করলেন। আহবান করার সাথে সাথে সমাগত বানরের ঝাঁক থেকে একটি বাচ্চা বানর বুদ্ধের সামনে এসে হাজির হল। বুদ্ধ অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—ভিক্ষুগণ। এটাই সেই বর্ষকার ব্রাহ্মণ।

অট্ঠকথার আরেক গল্পে দেখতে পাই শ্রাবস্তী জেতবন বিহারের দুজন ভিক্ষু এক সাথে ভিক্ষার্থে গ্রামে গিয়েছিলেন। গ্রামবাসী এক দারক তাঁদেরকে গরম যাগু দান করলেন।

সে সময় একজন ভিক্ষুর পেটে তীব্রবেদনা অনুভূত হতে ছিল। ভিক্ষু বেদনার উপশম হবে বিবেচনা করে পথে এক বৃক্ষের নীচে বসে গরম যাগু পানে প্রবৃত্ত হলে তদ্দর্শনে অপর ভিক্ষু মনে মনে ভাবলেন—কেমন অনাচারী ভিক্ষু, লজ্জা শরম ত্যাগ করে বিনয় বিরুদ্ধ কাজ করতে বসেছে। তাঁর সঙ্গে এসে আমাকেও লজ্জিত হতে হল। বেদনা কাতর ভিক্ষু ছিলেন অভিজ্ঞান প্রাপ্ত অর্হৎ। অপর ভিক্ষুর মনোবিতর্কের বিষয় অবগত হলেন। বিহারে এসে অর্হৎ ভিক্ষু অপর বিক্ষুকে বললেন—বন্ধো! আজ গ্রামান্তরে আমার যাগু পানের সময় তুমি কিছু ভাবছিলে নাকি? উত্তর দিল—ভাবছিলাম ভান্তে। অর্হৎ ভিক্ষু বললেন—এতে তোমার উচ্চতর মার্গ ফল লাভের অন্তরায় হয়েছে। মার্গফল লাভ আর তোমার পক্ষে সম্ভবপর নহে যদি তার প্রতিকার না কর। তাতে অপর ভিক্ষু অনুতপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ অর্হৎ ভিক্ষুর পদপ্রান্তে উপবেশন পূর্বক বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ইহাতে তার অন্তরায় বিমোচিত হয়ে গেল।

আদেশ অমান্য—অন্তরায়

শাস্ত্রে আরেক প্রকার অন্তরায়ের কথা উল্লেখ আছে, যা আদেশ অমান্য অন্তরায় নামে বর্ণিত। ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই — ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রামণ, শ্রামণী প্রভৃতি যারা নির্বাণ পথের অভিযাত্রী, তারা যদি জীবনের মহান ব্রত ধর্ম-বিনয়ের নীতি লঙ্ঘন করে, তা হলে শত চেষ্টা যত্ন সত্ত্বেও মুক্তির আশা সুদূর পরাহত। কাজেই বিনয়-

নীতি লঙ্ঘন করা পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বর্গ মোক্ষের অন্তরায়। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রামণ, শ্রামণেরীর পক্ষে প্রতিমোক্ষ সংবরণ-শীল অবশ্যই প্রতিপাল্য।

তথাগত বুদ্ধ বলেন,—

অয়ং পতিট্ঠা ধরনীব পাণিনং
ইদঞ্চ মূলং কুসলাভিবুদ্ধিযা।
মুখঞ্চিদং সব্ব জিনানুসাসনে,
যো সীলক্খন্ধো বর পাতিমোক্খিযো।

এই ধরণী যেমন জড়—অজড় সকল পদার্থের প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীকে আশ্রয় করেই জগতের সব কিছুর উৎপত্তি—স্থিতি নির্ভর; তেমন শীলই সকল ধর্ম-সাধনার মূল। সকল সর্বজিৎ বুদ্ধগণের অনুশাসন বা উপদেশের মধ্যে শীলই মুখ্য। শীল স্বর্গের, সোপান মোক্ষের দ্বার, বুদ্ধশাসনের আয়ু। আকাশে অট্টালিকার প্রতিষ্ঠা কল্পনা যেমন হাস্যকর তেমনি শীলাভিজাত্য ব্যতীত ধর্ম্মানুশীলন ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। অট্টালিকা নির্মাণের পূর্বে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করার ন্যায় শীলরূপ মূলভিত্তি দৃঢ় করেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। সাধনার অনুশীলনে যে মানসিক শক্তির আবশ্যক, চিত্তবৃত্তির উপর যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রয়োজন, এই কামনা—বাসনা বিক্ষুব্ধ বন্ধুর জীবন—ভূমিতে একমাত্র শীলই শান্ত সমাহিত করে সামগ্রিক ধর্ম—জীবনের অনুকূল ক্ষেত্র—ভূমি প্রস্তুত করে দিবে।

এই শীলের মধ্যে কতগুলো আছে প্রতিকারাতীত আর

কতগুলো প্রতিকারাধীন। মনুষ্য-হত্যা, চুরি, মৈথুন-সেবন ও লোকোত্তর ধর্ম সম্পর্কিত মিথ্যা কথন হতে বিরতি নামে যে মহাশীল, যা আদি ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যের আদি কল্যাণ যেগুলো লঙ্ঘন করলে ব্রহ্মচারীর শিরঃচ্ছেদ তুল্য; জীবনান্তেও যা লঙ্ঘন করা উচিত নহে তা লঙ্ঘন করলে প্রতিকার করা সম্ভবপর নয়। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট শীল-বিপত্তি ও আচার-বিপত্তি যা প্রতিকারাধীন, তা লঙ্ঘন করলেও পরিবাস, পাপদেশনাদি বিনয়-কর্ম দ্বারা প্রতিকার-পূর্বক শীল-বিশুদ্ধি পরিপূরণ রাখতে হয়। শীল বিপত্তি প্রাপ্ত ভিক্ষু শ্রামণের পক্ষে সাধন কর্মে অগ্রসর হওয়া তো সম্ভবপরই নয়। অধিকন্তু দুঃশীল, পাপ-ধর্মপরায়ণ, অশুচি লিপ্ত ভিক্ষু নিত্য পাপ কর্ম আচ্ছাদনকারী অভিক্ষু হয়ে ভিক্ষুরূপে, অব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারী রূপে, অশ্রামণ শ্রামণরূপে পরিচয় প্রদান পূর্বক জনগণের থেকে শ্রদ্ধাকর্ষণ করলেও সে সর্বক্ষণ স্বীয় পাপ কর্মের বিষয় আশঙ্কার সহিত স্মরণ করতে থাকে। তার অন্তর সব সময় দগ্ধীভূত হয়। তাতে অকুশল সংস্কার বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এ জাতীয় ভিক্ষু-শ্রামণ কখনো চিত্ত-বিমুক্তি, প্রজ্ঞা—বিমুক্তি লাভের আশা করতে পারে না। সমাজের শ্রদ্ধা প্রদত্ত ভাত-কাপড় আসবাব-পত্র ঔষধ-পথ্যাদি পরিভোগ করে অন্ধকার থেকে ঘোর অন্ধকারে ডুবে যায়। দুঃশীল দুরাচার অশুদ্ধ জীবন ভিক্ষু শ্রামণের সংসর্গ সকল প্রকার উন্নতিশীল শিক্ষাকামীর পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কলঙ্কিত জীবনের সমাজ সেবার

প্রবৃত্তি কলুষে পঙ্কিল। জীবসেবা তাদের দুর্নীতির প্রসারক, পরোপকার নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। যার জীবনে শীলরূপ প্রতিষ্ঠা নাই, সেই আপন ভ্রষ্ট ব্যক্তি কিরূপে পরকে প্রতিষ্ঠিত করবে? সমাধি প্রতিপক্ষ—কামরাগ ও ব্যাপাদ (পরের অহিত চিন্তা), প্রজ্ঞার প্রতিবন্ধক ও সত্যের প্রতিচ্ছাদক মোহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সমাধি ও প্রজ্ঞা ভাবনার পূর্ণাঙ্গ সাধন করতে শীল যে জীবনের ভিত্তি, তা যদি না থাকে, তবে কিসের উপর ভিত্তি করে সাধন সমরে অবতীর্ণ হবে? এ জন্যই শীল—বিপত্তি বা আদেশ অমান্য বিঘ্নতাকে স্বর্গ-মোক্ষের অন্তরায় রূপে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শমথ ও বিদর্শন ভাবনাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে পরিপন্থী ধর্ম সমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি না থাকলে সামান্য প্রমত্ততাবশতঃ ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। শীল—বিপত্তি কিংবা বৃহত্তর নীতি লঙ্ঘন তো দূরের কথা, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ব্রত-প্রতিব্রতের ভেদজনিত ত্রুটিতে যে ধ্যান নষ্ট হয়ে যায়, —এ সম্পর্কে অট্ঠকথার একটি গল্প প্রণিধান যোগ্য :— একদিন সমাপত্তি—লাভী এক ভিক্ষু গ্রামান্তরে পিণ্ডাচরণ করতে গিয়েছিলেন। পিন্ডাচরণ সমাপ্ত করে বিহারে ফিরে এসে দেখলেন—গ্রাম্য বালকের দল বিহারে এসে খেলা করছে। তজ্জন্য সমগ্র বিহার অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ভিক্ষু বিহার সম্মার্জন করা প্রয়োজন মনে করলেন বটে; কিন্তু তখন সম্মার্জন করলেন না। ভিক্ষু আহার কৃত্য সমাপন করে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ—পূর্বক যথারীতি ধ্যানাসনে

উপবিষ্ট হলেন। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও পূর্বলব্ধ ধ্যান-চিত্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হলেন না। তাতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর শীল-বিপত্তি কিংবা আচার-বিপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা। চিন্তা করে প্রথমতঃ কিছুই স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে বিহারের অ-সম্মার্জন জনিত ব্রতচ্ছেদটি লক্ষে পড়ল। তখন তিনি যথারীতি ধ্যানচিত্ত উৎপাদনে সক্ষম হলেন। সুতরাং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা গেল—এরূপ সামান্য ব্রত-ভেদ জনিত ত্রুটিও ধ্যানচিত্ত উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বস্তুতঃ শীল-বিশুদ্ধি রক্ষা না করলে চিত্ত-বিশুদ্ধি হয় না। অবিশুদ্ধ চিত্তে সাধনা করলে সংস্কার বৃদ্ধি করা যায় বটে; কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভবপর হবে না। তা' ছাড়া আরো কতগুলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে যে গুলো এড়িয়ে না চললে কর্মস্থান ভাবনার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ঃ—

আবাসো চ কুলং লাভো গণো কম্মং পঞ্চমং,
অদ্ধানং ঞাতি আবাধো গন্থো ইদ্ধি চ তে দসাতি।

১। আমিত্ব বোধের বাসস্থান, ২। চারি প্রত্যয় দায়কের কুল বা বংশ, ৩। বস্তু সামগ্রী লাভের প্রত্যাশা, ৪। শিষ্য—প্রশিষ্য, ছাত্র-ছাত্রী প্রভৃতি গণ-সংসর্গ, ৫। বৈষয়িক কাজকর্ম, ৬। দীর্ঘ পথে সর্বদা গমনাগমন, ৭। জ্ঞাতিবর্গের প্রতি প্রিয়তা, ৮। আপন রোগ শোক, ৯। গ্রন্থাদি পঠন পাঠন ও ১০। লৌকিক ঋদ্ধি বা তন্ত্রমন্ত্র কবচাদি। এই

দশবিধ অবস্থা কর্মস্থান ভাবনার প্রতিবন্ধক। কাজেই কর্মস্থান ভাবনাকারীর পক্ষে পূর্বেই এসব প্রতিবন্ধকের মূলোচ্ছেদ সম্পর্কিত সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিৎ।

শাস্ত্রে আঠার প্রকার বিহার ভাবনার অযোগ্য বলে উল্লেখ আছে। এসব বিহারে অবস্থান করে ভাবনায় আত্মনিয়োগ করলেও বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। অযোগ্য বিহারগুলো পরিত্যাগ করে চলা প্রয়োজন। আঠার প্রকার এই :

মহাবাসং নবাবাসং জরাবাসঞ্চ পথনিং,
সোণ্ডিং পন্নঞ্চ পুপ্ফঞ্চ ফলং পত্থিত মেবচ।
নগরং দারুনা খেত্তং বিস ভাগেন বট্টনং,
পচ্চন্ত সীমাসপ্পায়ং যথ মিত্তো ন লব্‌ভতি।

১। জনবহুল বিহার, ২। নব পরিকল্পিত বিহার, ৩। জরাজীর্ণ বিহার, ৪। পথি পার্শ্বস্থ বিহার, ৫। পানীয় জলপূর্ণ পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী বিহার ৬। শাকসব্জী সম্পন্ন বিহার, ৭। ফুল-বাগান যুক্ত বিহার, ৮। ফলন্ত বৃক্ষ বিশিষ্ট বিহার, ৯। তত্ত্বাবধায়ক শূন্য বিহার, ১০। নগরাসন্ন বিহার, ১১। কাষ্ঠাদি সম্পন্ন বিহার, ১২। ক্ষেত্রাসন্ন বিহার. ১৩। ঝগড়াপ্রিয় লোক সংশ্লিষ্ট বিহার, ১৪। খেয়াঘাটের বিহার, ১৫। প্রত্যন্ত বিহার, ১৬। সীমান্তবর্ত্তী বিহার, ১৭। অমনুষ্য পরিগৃহীত বিহার, ১৮। কল্যাণ মিত্র বিহীন বিহার। এই সকল ভাবনার অযোগ্য বিহার পরিত্যাগ করে লোকালয়ের নাতি দূরে নাত্যাসন্নে বিহার মনোনীত করতে হবে।

আবার সাত প্রকার সপ্রায়—অসপ্রায় (অনুকূল-প্রতিকূল) আছে যা গ্রহণ ও ত্যাগের আকারে ভাবনাকারীকে বিবেচনা করতে হবে। যেমন: আবাস, গোচর, ভাষ্য, পুদ্গল, ভোজন ঋতু ও ঈর্য্যাপথ—এই সাত প্রকার অবস্থা বিচার বুদ্ধির সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১। যে স্থানে বসে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হলে সাধকের পক্ষে আবাসানুকূল, অন্য সব স্থান প্রতিকূল।

২। যে আশ্রমে সাধকের প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আহারাদির সুব্যবস্থা আছে—তা সাধকের অনুকূল, অন্য সব আশ্রম প্রতিকূল।

৩। যে তির্যক কথায় সাধকের ভাবনার পরিহানি ঘটে, যা অমিত ভাষণ—তা-ই প্রতিকূল দশ কথাবথু, সম্বন্ধীয় ভাষ্যই সাধকের অনুকূল ভাষ্য।

৪। যে সব পুদ্গলের সংসর্গে সাধকের অসমাধিস্থ চিত্ত সমাহিত হয়। সমাহিত চিত্ত অধিকতর সুস্থির হয়, চঞ্চল চিত্ত সাম্যভাব ধারণ করে,—সেরূপ পুদ্গলই সাধনার অনুকূল, অন্যসব প্রতিকূল।

৫-৬। যে সাধকের যেরূপ খাদ্য উপযুক্ত, শীতলত্ব, উষ্ণত্বের মধ্যে যার পক্ষে যেরূপ সহনীয়, তাই সাধকের পক্ষে অনুকূল ভোজন ও ঋতু; অন্য সব প্রতিকূল।

৭। চার প্রকার ঈর্য্যাপথের মধ্যে যেটাতে সাধকের অভ্যাস প্রশস্ত হয়, তা-ই সাধকের অনুকূল ঈর্য্যাপথ, অন্য তিনটি প্রতিকূল।

এইভাবে সাত প্রকার অবস্থাকে গ্রহণ ও ত্যাগের

আকারে সাধক নিজেই নিজস্ব বিচার বুদ্ধির সাথে সিদ্ধান্ত করবেন। বিচার বুদ্ধির সহিত গ্রাহ্যকে গ্রহণ ও ত্যাজ্যকে ত্যাগ না করলে সাধনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা আছে।

ষোড়শ প্রকার সংশয় মার্গ-ফল লাভের অন্তরায়। বিদর্শন ভাবনার প্রভাবে সংশয় নিঃশেষে পরিত্যক্ত হয়। ষোড়শ প্রকার সংশয় কি কি - তা এক্ষেত্রে উল্লেখ করছি ঃ ১। আমি কি অতীতে ছিলাম ? ২। না — ছিলাম না ? ৩। আমি কি ছিলাম ? ৪। কিরূপ ছিলাম ? ৫। কিরূপ অবস্থা থেকে কিরূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়ে ছিলাম। ৬। আমি কি ভবিষ্যতে হব ? ৭। আমি কি ভবিষ্যতে থাকব না ? ৮। কি হব ? ৯। কিরূপ হব ? ১০। কিরূপ অবস্থা থেকে কিরূপ অব্যস্থায় পরিবর্ত্তিত হব ? ১১। আমি কি বর্তমানে আছি ? ১২। আমি কি বর্তমানে নাই ? ১৩। আমি কি আছি ? ১৪। আমি কিরূপ আছি ? ১৫। আমি কোথা থেকে এসেছি ? ১৬। আমি কোথায় যাব?

বৌদ্ধ ধর্মসম্মত কর্মবাদের আদর্শ বিচারে দেখা যায়— বর্তগামী ও বিবর্তগামী নামে কর্ম দ্বিবিধ। হিংসা—হত্যা, চুরি. ব্যভিচার, মিথ্যা, মত্ততা ইত্যাদি অকুশল কর্ম যেমনি প্রাণীগণকে জন্ম-জন্মান্তরে আবর্তিত করে, তেমনি অহিংসা, অস্তেয়, সত্য-সংযম ও দান-ধর্মাদি কুশল কর্মও প্রাণীগণকে জন্ম হতে জন্মান্তরে আবর্তিত বিবর্তিত করে। কুশলাকুশল

উভয় কর্মই জন্ম নিয়ামক, সংসার-পরিধি বর্দ্ধক। জন্ম হলেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক রোগ, দুঃখ, পরিদেবন, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সূক্ষ্মছিদ্র জাল দ্বারা একটি জলাশয়কে সম্পূর্ণরূপে বেড় দিলে জলাশয়স্থ মৎস্যকুল যেমন জালের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে উন্মজ্জন নিমজ্জন করতে আরম্ভ করে, তেমনি বর্তগামী কর্মদ্বারা আবদ্ধ হয়ে প্রাণীগণ সংসার সমুদ্রের জন্মমৃত্যুর আবর্তনে হাবুডুবু খেতে থাকে। এমন কি প্রবলতম বীর্য প্রভাবে কঠোর সাধনালব্ধ সমাপত্তি ধ্যানে চিত্ত-বিমুক্তি লাভ করলেও জন্মমৃত্যুর আবর্তন-বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে বলে কর্ম-জাল বা কর্ম-বন্ধন।

এক্ষেত্রে আরো লক্ষ্য করার প্রয়োজন যে, দীর্ঘ-নিকায় গ্রন্থের সর্বপ্রথম সূত্রের নাম ব্রহ্মজাল বা দৃষ্টিজাল। এই সূত্রে শাশ্বত—উচ্ছেদ মূলক পূর্বান্তবর্তী (অতীতাংশ) জীবন-জগৎ সম্পর্কিত ১৮ প্রকার মতবাদ এবং অপরান্তবর্তী (অনাগতাংশ) জীবন জগৎ সম্পর্কিত ৪৪ প্রকার মতবাদ—সর্বমোট ৬২ প্রকার মতবাদ বা মিথ্যাদৃষ্টির বিষয় উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ সমাপত্তি ধ্যান লাভী চিত্ত-বিমুক্তি লব্ধ। তথাগত বুদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় এই বহুবিধ ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে গভীর ভাবে আলোচনা ও মীমাংসা করেছেন। এ সকল মতবাদ বা দৃষ্টিজালও সাধকের অন্তরায়।

অন্তরায় যে সব সময় শুধু অকুশল জাতীয় হবে, তাও

নয়। ক্ষেত্র বিশেষে অন্তরায় কুশল ভিত্তিক হওয়াও সম্ভব। মৈত্রী ভাবনা বা পরহিত চিন্তা, শ্রদ্ধা-চিত্তে গ্রন্থাদি পাঠ, সূত্র আবৃত্তি বুদ্ধ পূজা, তীর্থ ভ্রমণের স্মৃতি যদি বিদর্শন সাধকের অন্তরে মুহুর্মুহু জাগরিত হতে থাকে; তবে অখণ্ড স্মৃতি সাধকের কুশলকর্ম বা কর্মচিন্তাও সাধনার অন্তরায়। বর্তগামী কুশলচিত্ত যে বিবর্তগামী কর্মের অন্তরায়—সে সম্পর্কে একটি গল্প বড় প্রণিধান যোগ্য।

একজন শ্রদ্ধাবান উপাসক সারাজীবন দান ধর্মাদি কুশল কর্মে নিরত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যায়ে এসে তিনি বিদর্শন সাধনা নীতির অনুশীলন করবেন—সংকল্প করলেন এবং তদনুযায়ী—একজন সুযোগ্য ভাবনাচার্য্যের নিকট ভাবনা-ব্রত গ্রহণ পূর্বক যথারীতি অনুশীলন করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু উপাসক ভাবনার অনুশীলনে কিছুতেই মন বসাতে পারলেন না। উঠতে বসতে শয়নে স্বপনে সর্বক্ষণ সমুদ্র তরঙ্গের মত তাঁর চিত্ত প্রবাহে শুধু পূর্বকৃত বুদ্ধ-পূজা, দানধর্মাদি কুশলকর্মের স্মৃতি একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল। ফলে তাঁর গৃহীত ব্রতে স্থির থাকতে পারলেন না। অবশেষে ভাবনা ব্রত ত্যাগ করে চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, সাধনার গতি নির্দ্ধারণ কল্পে সাধকের অন্তরে কুশল চিত্ত—বা অকুশল চিত্ত—যখন যেরূপ চিত্তই উৎপন্ন হোক না কেন, তৎমুহূর্তে চিত্তের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধিতে বিচক্ষণ সাধক বিদর্শন সাধনার নীতি—আরোপ করতে সক্ষম হন। সাধনার প্রণালী বর্ণনায় যাকে বলা হয়েছে চিত্তে চিত্তানুদর্শণ।

সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে ভিক্ষুগণকে লক্ষ্য করে তথাগত বুদ্ধ উপদেশ প্রদান করলেন :

সত্তিয়া বিয ওমট্‌ঠো ভযহমানোব মত্থকে,
সক্কায় দিট্‌ঠি প্পহানায সতো ভিক্‌খু পরিব্বজে।

বিদর্শন সাধনার মাহাত্ম্য আরোপ করে বুদ্ধ বলেন যে, বক্ষে বিষাক্ত শেল বিদ্ধ হলে কিংবা অগ্নিতে মস্তক দগ্ধ হতে থাকলে মানুষ তার থেকে মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, তেমনি সৎকায়—দৃষ্টি বা দেহ—মন সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা প্রসূত রাগ, দ্বেষ ও মোহাগ্নিতে দগ্ধীভূত জীবনে মুক্তির জন্য বিরাগী ভিক্ষু সতত স্মৃতি সাধনায় নিরত থাকবেন। দৃঢ় পরাক্রমে অবিরাম বিদর্শণ বা স্মৃতি সাধনার অনুশীলন করতে থাকলে সাধক ভিক্ষু কায়গত ভ্রান্তি (সংজ্ঞা—গত ভ্রান্তি চিত্তজ ভ্রান্তি, মিথ্যা দৃষ্টিজ ভ্রান্তি) যা অনিত্যে নিত্য, দুঃখে সুখ স্বপ্ন, মল-ভাণ্ডে অমৃত কল্পনা, অনাত্মে আত্ম ধারণা, অসত্যে সত্য-ভ্রম জন্মায়. তা সর্বতো-ভাবে নিরসন করে সর্ব সংস্কারের প্রতি বীত-তৃষ্ণ হয়ে উঠবেন। অহোরাত্র এরূপ অখন্ড স্মৃতি সাধনার ফলে সাধকের অন্তরাকাশে সম্যকরূপে দীপ্ত হয়ে উঠবে জীবন ও জগতের প্রতি অনিত্য—দুঃখ—অনাত্ম জ্ঞান। সাধনা শীর্ষ এই জ্ঞান ক্রমঃ বিবর্দ্ধমান অবস্থায় দীর্ঘকাল বহনের পর আশি মণের বোঝা কাঁধ থেকে নামানোর ন্যায় বা ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায় সাধকের অন্তরে একদিন সৌভাগ্যক্রমে এক অনির্বচনীয় অলৌকিক অনুভূতি জাগবে। এটাই বিবর্ত-গামী কর্মের ধারা। কর্মের যে ধারায় জন্ম মৃত্যুর আকারে সংসার চক্রে আবর্তন বিবর্তন চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। তবেই তো পরমা শান্তি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে স্বকীয় মহিমায় বিরাজমান অন্যতম ব্যক্তিত্ব মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের ১৯১৪ সালে কুমিল্লা জেলার বরইগাঁও এর কেমতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—চন্দ্রমণি সিংহ, মাতা—দ্রোপদীবালা সিংহ। তিনি ১২ বছর বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা এবং ২৪ বছর বয়সে উপসম্পদা নেন।

মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর শিক্ষার্থী জীবনের অধিকাংশ চট্টগ্রামে অতিবাহিত হয়। মহামুনি পাহাতলীতে পণ্ডিত ধর্মধার মহাস্থবিরের নিকট তিনি পালি ও ধর্মশাস্ত্র ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। কলকাতার ধর্মাংকুর বিহারেরও তাঁর শিক্ষাজীবন পরিচালিত হয়।

মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের বরইগাঁও বৌদ্ধবিহারে স্থায়ীভাবে বাস করার সময় তিনি একটি পালি পরিবেণ, একটি অনাথাশ্রম, ছাত্রাবাস, বয়নকেন্দ্র, সমাজ-কল্যাণ কেন্দ্র পাঠাগার ও একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। তিনি একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ২৮ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর কর্ম প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলন কর্তৃক শান্তি পদকে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর কর্ম ক্ষমতায় মুগ্ধ সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি পাহাড়ে "বিশ্বশান্তি প্যাগোডা প্রকল্প" বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁকে অর্পন করেছেন। বহুগ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথেরো একজন সাধক। বর্তমান গ্রন্থ বৌদ্ধ সাধকদের পথ নির্দেশক হবে যদি হৃদয়ঙ্গম ও সঠিক প্রয়োগ করা যায়।

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and pepole would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

✻ The Vows of Samantabhadra ✻

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

✻ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ✻

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：SADHANAR ANTHARAI》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
3,000 copies; April 2011
BA029 - 9261